আনন্দবাজার পত্রিকা

How To Trade Confidently When The Market Feels Unpredictable

কলকাতার আকাশে এক আগুনপাখি

বার বার মানুষ পথে নেমেছে অন্যায়ের প্রতিকার চেয়ে। সময় বদলেছে, কারণ বদলেছে, বদলে গিয়েছে পরিপ্রেক্ষিত। কিন্তু একই থেকেছে ন্যায়বিচারের প্রার্থনায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। রাজনৈতিক রং ছাড়াই রাজপথে নামার নির্ভীক দৃঢ়তা। **অশোককুমার মুখোপাধ্যায়**

ঐক্যবদ্ধ: আর জি করে নিহত তরুণী চিকিৎসকের জন্য গণ-আন্দোলন মনে করিয়ে দেয় শহরবাসীর প্রতিবাদের ইতিহাস। *ছবি: দেবস্মিতা ভট্টাচার্য*

বিপ্লব হল বঞ্চিত-নিপীড়িত জনতার উৎসব, লেনিনের এই কথা তো আমরা দেওয়ালের লেখায়, কাগজে-কলমে ভাষণে বহু বার দেখেছি, শুনেছি। গত ৮ সেপ্টেম্বর তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে রিকশা-শ্রমিকদের হেদুয়া থেকে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত মিছিল সেই কথাই আবার মনে করাল। গত অগস্ট থেকে শুরু হওয়া ডাক্তারদের বিক্ষোভের সঙ্গে, মেয়েদের রাত-দখল আন্দোলনের মিছিলের সঙ্গে, স্কুল-পড়ুয়া, প্রাক্তনী, ডেলিভারি শ্রমিক, মৃৎশিল্পীদের সঙ্গে, শহর জুড়ে মানববন্ধনের সঙ্গে মিলে গেল সেই রিকশা-শ্রমিকদের মিছিল।

১৯২০ সালে সাংবাদিক ক্লারা জেটকিনকে ভ্লাদিমির লেনিন বলেছিলেন, মেয়েদের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনও সত্যিকারের গণ-আন্দোলন হয় না। অভয়ার খুনির বিচার চেয়ে মা-বোনেদের রাত দখলের আন্দোলন, এবং তার পর গুণোত্তর প্রগতিতে বাড়তে থাকা একাধিক আন্দোলনকে ওই মন্তব্যের নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে, ডাক্তারদের আন্দোলন প্রকৃত গণ-রূপ পেয়েছে।

১৯৪০-এর দশকের কলকাতা, অর্থাৎ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের কলকাতা, লাঠি গ্যাস গুলির ভয় উপেক্ষা করে আমাদের মিছিলে হাঁটতে শিখিয়েছিল। সে এক আশ্চর্য সময়, স্বাধীনতার জন্য জনতার উত্তেজনা যেন ফেটে পড়ছে— হয় স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু। বাধা দিতে এসেছে ব্রিটিশ, লড়াই বেধেছে। ফলত, ঘোষণা অহিংস আন্দোলনের হওয়া সত্ত্বেও, অগস্ট আন্দোলনের আরম্ভের দিন ৯ অগস্ট ১৯৪২ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ পর্যন্ত, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অভিঘাতে আক্রান্তের খতিয়ান ছিল এই রকম: ৫৫০টি পোস্ট অফিস, ২৫০টি রেল স্টেশন। বহু জায়গায় রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত; ৭০টি পুলিশ ফাঁড়ি ধ্বংস, ৮৫টি সরকারি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত বা ভস্মীভূত হয়। ২৫০০ জায়গায় টেলিগ্রাফের তার কেটে ফেলা হয়। এই সবই জনতার অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ। এই আন্দোলনই ভারতবাসীকে পূর্ণ স্বরাজের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিল।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে ও পরে হয় তেভাগা আন্দোলন। শহরাঞ্চলে, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ও কলকাতায় তেভাগার পক্ষে প্রচার চলেছে বহুদিন। কলকাতা দাঁড়িয়েছে কাকদ্বীপের তেভাগা আন্দোলনের পক্ষে। ওই সময়েই সলিল চৌধুরী লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'শপথ': "সেদিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে হরতাল হয়েছিল... কোনো ডালে কোনো কুঁড়িরা ফোটেনি, কোনো অঙ্কুর মাথাও তোলেনি, প্রজাপতি যত আরো একদিন গুটিপোকা হয়েছিল, সেদিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে হরতাল হয়েছিল।" খাঁপুরের তেভাগা আন্দোলনে কৃষক কর্মীদের ঠোঁটে গানের কলি ছিল 'নাল (লাল) বরণ ঝান্ডা/ রগ্নি (অগ্নি) বরণ কাইদা/ এ ভারত করতে স্বাধীন/ সবাই মিলে আগা।' ১৯৪৭-এর ২০ ফেব্রুয়ারি মাঝরাতে গ্রামে পুলিশ ঢুকতেই যশোদা রানী শঙ্খ বাজিয়ে গ্রামের সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, কৃষকরা কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। বন্দুকের বিরুদ্ধে তির-ধনুকের অসম যুদ্ধে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন যশোদা রানী। ক্ষিপ্ত খেতমজুর চিয়ার-সাই-শেখ বাড়ি থেকে শাবল নিয়ে এসে, পুলিশ ট্রাকের চাকা অকেজো করে দেন। পরিণাম, তিনটি গুলি বিদ্ধ করে তাঁর শরীরও। সেই রাতের লড়াইয়ে সব মিলিয়ে মারা যান ২২ জন।

কাকদ্বীপের তেভাগা আন্দোলনে কলকাতার ডাক্তাররা গিয়ে তাঁদের সমর্থন জুগিয়েছেন। শিখিয়েছেন, শরীরে বুলেট লাগলে তা কী ভাবে বার করতে হবে; দিয়েছেন প্রাথমিক চিকিৎসার পাঠ। মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার পূর্ণেন্দু ঘোষ বুধাখালির কৃষকদের 'রাঙা ডাক্তার' হয়ে উঠেছিলেন। কাকদ্বীপ তেভাগা লড়াইয়ের সমর্থনে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল একাধিক পত্রপত্রিকা, ইস্তাহার।

১৯৫১ সালে কোচবিহারে খাদ্য আন্দোলনের মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত হল ষোলো বছরের এক মেয়ে। তার মায়ের বুকফাটা হাহাকার: মেয়ের বিয়ের সব ব্যবস্থা হয়েছিল সারা, নিষেধ না মেনে কেন সে গেল ওই সর্বনাশী মিছিলে! এই মেয়েকে নিয়েই শঙ্খ ঘোষের সেই কবিতা, 'যমুনাবতী'। "যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে/ যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে/ বিষের টোপর নিয়ে।/ যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে/ দিয়েছে পথ, গিয়ে।" কবিতার চলনে যদি এক উৎসবের মেজাজ, অন্তরে আত্মাহুতির শপথ! কী আশ্চর্য সমাপতন, আমাদের অভয়া-তিলোত্তমাও চলে গেল ঠিকই, কিন্তু সব জড়তা কাটিয়ে আমাদের বাঁচবার পথটি দেখিয়ে গেল!

'৫১-র পরে '৫৩-র জুলাই, কলকাতার রাস্তায় পুলিশের মুখোমুখি সাধারণ ছাত্র-যুব-জনতা। ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণির ভাড়া বাড়ানো হয় ১ পয়সা। তখন প্রথম শ্রেণির ভাড়া ৫ পয়সা, দ্বিতীয় শ্রেণির ৩ পয়সা। ১ জুলাই থেকে এই বৃদ্ধি কার্যকর হয়। ওই দিন থেকে শুরু প্রতিরোধ। তিন হাজার প্রতিবাদীকে জেলে পুরে, চার জনকে নিহত করে, কিশোর স্কুলছাত্রকে বুলেটে আহত করার পরেও ট্রাম বয়কট অব্যাহত। সম্মিলিত প্রতিরোধ ক্রমশ জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।

১৯৫৯ থেকে ১৯৬৬, ভাতের লড়াই। স্বাধীনতা লাভের বারো বছরের মধ্যেই খাদ্যাভাব, ব্যাপক কালোবাজারি। দিনেশ দাশ লিখলেন 'ভুখ-মিছিল': "খোলো নয়ন হে অন্ধ/ এখানে আজ ঘোরে না সেই মহাসমর কবন্ধ?/ এই দারুণ ক্রন্দনেই/ যুদ্ধ নেই? যুদ্ধ নেই?/ তবু আকাশ স্তব্ধ নীল/ নিম্নে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ-মিছিল।" অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি হতে থাকে। এমনই এক প্রতিবাদী সভায় মঞ্চে বসে মণিকুন্তলা সেন লক্ষ করলেন, "অস্থিচর্মসার, অর্ধউলঙ্গ দেহ নিয়ে মাঠ জুড়ে বসে আছে আমাদের গ্রামের কয়েকজন— যাদের মেহনতের ফলে আমাদের অন্ন জোটে।" প্রতিবাদীদের পরিকল্পনা ছিল সভা শেষে রাইটার্স বিল্ডিং ঘেরাওয়ের, সে দিকে একটি মিছিল পা বাড়াতেই পুলিশের আক্রমণ। গ্রামের কৃষক কলকাতার পথঘাট চেনে না, পালানোর পথ জানা নেই তাদের। নারী-পুরুষ মিলিয়ে আশি জন নিহত হলেন পুলিশের আক্রমণে।

খাদ্যের জন্য আন্দোলন চলতে চলতে ১৯৬৫-তেই মালুম হয়েছিল সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান রাগ আর অসন্তোষ। যখন দেশে উপোসী মানুষের সংখ্যা তিন কোটি, আমেরিকা, পিএল৪৮০ খাতে বরাদ্দের অতিরিক্ত, ১৫ লক্ষ টন গম সরবরাহে রাজি হয়েছে; সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে কানাডা, ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ; যখন দেশে দেশে ক্ষুধা ও খাদ্যই বিদ্রোহ-বিপ্লবের অন্যতম প্রধান নিয়ামক, এ দেশে এ রাজ্যে তার ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? প্রায় প্রতিদিনই খাদ্যের দাবিতে মিছিল। আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে ১৯৬৬-র ফেব্রুয়ারিতে। বসিরহাটের স্বরূপনগরে পুলিশের গুলিতে মারা গেল ক্লাস ফাইভের নুরুল ইসলাম। পরে বাদুড়িয়া, কৃষ্ণনগর। ওই ছাত্রদের মিছিলেও পুলিশ গুলি চালায়; নিহত হন তরুণ আনন্দ হাইত। গ্রামের মানুষের সঙ্গে কলকাতার মানুষও বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। কলেজ স্ট্রিটে তখন প্রায় রোজই পুলিশের সঙ্গে লড়ছে প্রেসিডেন্সি কলেজ আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা। তাদের ছোড়া ইটের ঘা থেকে বাঁচতে পুলিশের হাতে উঠল জালি দেওয়া ঢাল, মাথায় শিরস্ত্রাণ। মার্চের গোড়ার দিকে, সরকার এক আদেশবলে রাজ্যের সব স্কুল-কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দিলেন। ১০ মার্চ বাংলা বন্‌ধ পেল অভূতপূর্ব সমর্থন। বোঝা-ই যাচ্ছিল, কংগ্রেস জমানা শেষের পথে, আসছে বামপন্থীদের রাজপাট।

বামপন্থার যে আবহ এল পশ্চিমবঙ্গে, সেই স্রোত বেয়েই উত্তরবঙ্গের তরাই এলাকায় জমি তথা ক্ষমতা দখলের সূচনা। সেই উজ্জীবনেই ঘটল নকশালবাড়িতে কৃষকদের সঙ্গে পুলিশের মুখোমুখি সংঘর্ষ। শিশু, নারী-সহ নিহত মোট এগারো জন। জন্ম নিল নকশালবাড়ি ও কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটি, যার গর্ভ থেকে এল এক নতুন কমিউনিস্ট পার্টি, যাদের লক্ষ্য সশস্ত্র বিপ্লব। কুম্বিং-এনকাউন্টারে সন্ত্রস্ত সত্তরের কলকাতায় এ শহরের যৌবন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুদ্ধে লড়ে গেছে, যেন এক উৎসবের ঘোরেই। অকস্মাৎ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকা ব্রিগেড মাঠের সামনে জড়ো হয়ে, গুটিয়ে রাখা লাল পতাকা তুলে ধরে, স্লোগান দিতে দিতে কিছুদূর চলার পরে, পুলিশ আসার আগেই তাদের বিভ্রান্ত করে উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা আজও মনে পড়বে অনেকের।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের, সেই ১৪ নভেম্বর ২০০৭-এর পতাকাহীন মহামিছিল তো এই সে দিনের কথা। ওই মিছিল যতটা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষকদের পক্ষে, ততটাই শাসকদের প্রতি ক্ষোভ উদ্গীরণেরও। যুবক-যুবতীদের সঙ্গে হেঁটেছেন প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, হুইলচেয়ারে বসা অশক্ত বৃদ্ধাও ছিলেন সেই দীর্ঘ মিছিলে! জানবাজার পেরিয়ে এলিট সিনেমার সামনে সেই বিপুল পদযাত্রায় এসে দাঁড়ালেন মৃণাল সেন, কী বিপুল উল্লাস জনতার! শঙ্খ ঘোষ লিখলেন একাধিক কবিতা, প্রতিটিই হৃদয়ে তুলে নিলেন আন্দোলনকারীরা।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরাশি বছর পরে, সেই অগস্ট বিপ্লবের প্রতিবিম্ব ধরা পড়ল অভয়া-তিলোত্তমার বিচার চাওয়া ডাক্তারদের আন্দোলনের আয়নায়, এই ২০২৪-এর অগস্টে। এ আন্দোলনের স্বকীয়তা তার নতুন রকমের ভাবনায়। প্রতিবাদের এত বৈচিত্র, এত বিভিন্ন প্রকরণ গত পঞ্চাশ বছরে চোখে পড়েনি। রাত দখলের আন্দোলন শুরু হল মধ্যরাতের জমায়েতে, গান দিয়ে— 'কারার ওই লৌহকপাট, ভেঙে ফেল কররে লোপাট' কিংবা 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'। গানের পর গান গাইতে গাইতে মিছিল চলেছে, আর উঠছে স্লোগান, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। মূল ভাবনা অক্ষুণ্ণ রেখে ওই সময়েই রচিত হল নতুনতর স্লোগান, 'তোমার বোন আমার বোন, তিলোত্তমা সবার বোন', কিংবা 'সব জনতার একটি স্বর, জাস্টিস ফর আর জি কর'। ময়দানের তিন প্রধান ক্লাব মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর মহমেডান-ও ডাক দিল: 'তিন প্রধানের একই স্বর, জাস্টিস ফর আর জি কর!'

প্রায় প্রতিদিনই, জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন স্লোগান ও গান। পুরনো দিনের গান 'উই শ্যাল ওভারকাম', 'পথে এবার নামো সাথী', 'ও আলোর পথযাত্রী'র পাশে প্রতিবাদী মিছিলে দিব্যি জায়গা করে নিয়েছে অরিজিৎ সিংহের 'জমছে এক পাহাড়, অসহ্য অবিচার/... স্তব্ধ হয়ে ছিল তারা ব্যস্ততা হাজার!/ তাই যে নাই খেয়াল, পেছনেই দেয়াল!/ যে যেমন সে নিচ্ছি মেনে, নাম দিয়ে কপাল/ কেউ মরণ অকাল, কেউ ভয়ে কাতর/ কেউ বা নিরুপায়, বা, অসহায় হয়ে পাথর!/ আর কবে? আর কবে? আর কবে?...' রাস্তায় আঁকা হয়েছে আলপনায় মোড়া স্লোগান; হয়েছে পথনাটিকা। ঘর নিষ্প্রদীপ রেখে, মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদ-কর্মসূচির পাশাপাশি অভয়া-তিলোত্তমার নাম লেখা রাখি, ব্যাজ ঠাঁই পেয়েছে বুকে।

সবচেয়ে বড় কথা, সাধারণের সমর্থন পেয়েছেন প্রতিবাদীরা। লালবাজারের কাছে অবস্থান-প্রতিবাদ করলেন যে জুনিয়র ডাক্তাররা, তাঁদের মাথার উপরে আচ্ছাদন, রাতের খাবার, সকালের চা জোগালেন আশপাশের মানুষ। ডাক্তারদের আন্দোলন জনতাকে জড়িয়ে নিল সঙ্গে; গান, স্লোগান, রাত-দখল থেকে মানববন্ধন সব কিছু মিলে যেন সেই পুরনো দিনের আন্দোলনের উৎসবের মেজাজটিকে ছুঁল। যে মেজাজে স্বচ্ছন্দে পথে নামা যায়, যে নির্মল উত্তেজনায় পুলিশের লাঠি-গুলির সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়া যায়। তেভাগা আন্দোলনের সময় বালুরঘাট হাসপাতালের বিছানায় মৃত্যুর চৌকাঠে পা-রাখা কৃষককে ডাক্তার যখন জিজ্ঞাসা করছেন, তোমার কিছু বলবার আছে? উত্তরে সে উচ্চারণ করেছিল, 'তেভাগা চাই'।

আজকের আন্দোলনকারীদেরও প্রথম থেকে শেষ কথাটি তেমনই— 'বিচার চাই'। অভয়া-তিলোত্তমা এক আগুনপাখি হয়ে যেন উড়ে বেড়াচ্ছে কলকাতার আকাশে।

'রবিবাসরীয়' বিভাগে নিবন্ধ পাঠান। শব্দসংখ্যা ৮০০-১২০০। ইউনিকোড ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। পিডিএফ-এ নয়, ওয়ার্ড ফাইল ইমেল করুন।
ইমেল: **rabi.article@abp.in**
সাবজেক্ট: **Rabibasariya Nibandha**
পাণ্ডুলিপিতে ফোন নম্বর ও সম্পূর্ণ ঠিকানা দেবেন।

You May Like
How To Succeed In Trading—Wish I Knew This Sooner!
Exness